Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XIV, Issue-II, January 2026, Page No. 111-121
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in
DOI: 10.64031/pratidhwanitheecho.vol.14.issue.02W.054

ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে রাজনীতি: প্রসঙ্গ পঞ্চতন্ত্র

পূজা কর্মকার, *অতিথি অধ্যাপিকা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, বাঁকুড়া খ্রিস্টান কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 30.12.2025; Accepted: 03.01.2026; Available online: 31.01.2026
©2026 The Author(s). Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In the rich tapestry of Indian knowledge tradition, warfare and diplomacy are not mere instruments of conflict rather they are sophisticated tools to uphold justice, ethical order, and societal harmony. This paper investigates these timeless principles through the lens of the Panchatantra; a collection often celebrated as moral tales yet brimming with strategic political wisdom. Drawing from classical texts like the Mahabharata, Ramayana, and Kautilya's Arthashastra, the study unravels how intelligence, morality, and foresight guide leadership and decision-making. The Panchatantra, with its five key divisions like Mitra-bheda (separating friends), Mitra-lābha (gaining friends), Kākolūkīyam (strategic maneuvering), Lābha-pakṣaṇam (preserving gains), and Aparīkṣita-karakaṁ (avoiding rash acts) offers enduring lessons on alliances, conflict resolution, and prudent governance. By bridging ancient narratives with modern strategic relevance, this paper demonstrates that the wisdom of the Panchatantra remains an indispensable guide for contemporary diplomacy, ethical leadership, and effective governance.

Keywords: Indian knowledge system, panchatantra, diplomacy, ethical governance, realpolitik

ভারতবর্ষ শুধু একটি ভূখণ্ড নয় বরং একটি জ্ঞানধারার নদী, যা হাজার হাজার বছর ধরে অবিরাম বয়ে চলেছে। এই নদীর জলে আছে বেদ–উপনিষদের গভীরতা, পুরাণের রঙ, গীতার জীবনদর্শন, আর্যভট্টের গণিত, চরক–সুশ্রুতের চিকিৎসাবিদ্যা, পঞ্চতন্ত্রের নীতি–জ্ঞান, আবার রামায়ণ–মহাভারতের নৈতিকতা, যোগ–ধ্যানের শান্তি, ভক্তি–সুফিতন্ত্রের প্রেম এবং মানবকল্যাণের অন্তহীন সুর। এই পুরো ধারাকেই একসাথে আমরা বলি 'ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরা', যা কেবল অতীতের ধন নয় বরং আজকের জীবনের পথপ্রদর্শক।

এমন একটা সময় বর্তমান ছিল, যখন মনে করা হত ভারতীয়দের নিজস্ব জ্ঞানপরম্পরা বলতে কিছু নেই, যা ছিল তা হল পাশ্চাত্যের অনুকরণ মাত্র। কিন্তু কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র প্রকাশের (১৯০৫) সাথে সাথে এই ধারনাগত ঔচিত্য চূর্ণ হয় এবং পরে ভারতীয় ধর্মশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র যেমন মহাভারত, রামায়ণ ইত্যাদি, নানা গল্প ও সাহিত্যের মাধ্যমে ভারতীয় রাজনীতি তত্ত্বের প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হতে থাকে। বলা বাহুল্য যে, প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরা জীবন ও রাষ্ট্র পরিচালনাকে এক সমন্বিত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে এসেছে। এখানে ধর্ম, নীতি, রাজনীতি, যুদ্ধ এবং অর্থনীতিই সবই একে অপরের সাথে সম্পর্কিত বা interconnected। যা নির্দেশ করে জীবন কেবল ব্যক্তিগত স্বার্থ বা ক্ষমতার লড়াই নয়, বরং সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ বজায় রাখার এক পদ্ধতিগত কৌশলস্বরুপ। মহাভারত, রামায়ণ, কৌটিল্যর অর্থশাস্ত্র- এই গ্রন্থগুলোতে দেখা যায়,

রাষ্ট্র পরিচালনা ও যুদ্ধ শুধু সামরিক শক্তির বিষয় নয়; এটি নৈতিকতা, কৌশল এবং দূরদর্শিতার সমন্বয়। মহাভারতে অর্জুনের যুদ্ধে দ্বিধার প্রসঙ্গ থেকে প্রমাণিত হয় যুদ্ধ কেবল শত্রু ধ্বংসের মাধ্যম নয়, বরং ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্যও যুদ্ধ প্রয়োজন কিন্তু যুদ্ধজয় করা মানেই জয় নয়। অর্থাৎ এখান থেকে বোঝা যায়, প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে সুনেতৃত্ব এবং শাসনের ক্ষেত্রে নৈতিকতা অপরিহার্য ছিল।

অন্যদিকে কৌটিল্যর অর্থশাস্ত্র অনুযায়ী, যুদ্ধ তিন ভাগে বিভক্ত যথা প্রকাশযুদ্ধ, কূটযুদ্ধ এবং তূষ্ণীযুদ্ধ। প্রকাশযুদ্ধ হলো সরাসরি সামরিক সংঘর্ষ, কূটযুদ্ধ হলো কৌশল ও তথ্যের মাধ্যমে শত্রু মোকাবিলা, আর তূষ্ণীযুদ্ধ হলো আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধান। অর্থাৎ ভারতীয় জ্ঞানপরম্পরার এই সমন্বিত দৃষ্টিকোণ আধুনিক প্রশাসন, কূটনীতি এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কে খুবই প্রাসঙ্গিক। কারণ রাষ্ট্র যখন ন্যায়, কৌশল এবং বুদ্ধি মিলিয়ে পরিচালিত হয়, তখন তা স্থিতিশীল, সুরক্ষিত এবং সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। এইভাবেই প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞানপরম্পরা আমাদের শেখায় যে, শক্তি অর্জনই কেবলই যথেষ্ট নয়; নেতৃত্বের মূলমন্ত্র হলো বুদ্ধি, নৈতিকতা এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা, যা কোনো দেশের সুশাসনের ভিত্তিভূমি।

মূল আলোচনা:

পঞ্চতন্ত্র হল প্রাচীন ভারতের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ নৈতিক ও শিক্ষামূলক সাহিত্যকর্ম। পঞ্চতন্ত্র রচয়িতা বিষ্ণু শর্মা, প্রাচীন সাহিত্যে তাঁর পরিচয় শিক্ষক, দার্শনিক ও নীতিশাস্ত্রের একজন প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি হিসেবে। বলা হয়, তিনি এক সময় এক রাজকীয় শিক্ষার অংশ হিসেবে রাজপুত্রদের নৈতিক ও কৌশলগত শিক্ষা দেওয়ার জন্য এই গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।পঞ্চতন্ত্রের প্রাচীনতম সংস্করণ প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ৩র্থ–৪র্থ শতাব্দীতে (C. 300 BCE – 200 CE) ভারতীয় উপমহাদেশে রচিত হয়েছে বলে মনে করা হয়। তবে এটি মৌখিক রূপে আগে থেকেই প্রচলিত ছিল এবং পরে রচনার মাধ্যমে তা লিখিত আকারে সংরক্ষিত হয়েছে।

আক্ষরিকভাবে পঞ্চ মানে পাঁচ এবং তন্ত্র শব্দটির অর্থ হল (ভারতীয় পরম্পরা অনুসারে) যেকোনো সুসংগঠিত সিদ্ধান্ত, বিধি, উপকরণ , কলাকৌশল বা কার্যপ্রণালী। অর্থাৎ পাঁচ উপকরণের সমষ্টি। তবে এটি সাধারণত শিশুদের জন্য প্রচলিত গল্পগ্রন্থ বা শিশুসাহিত্য হিসেবে অধিক পরিচিত যেটি ৫০ এর বেশি ভাষায় অনুবাদিত ও ২০০ এরও বেশি সংস্করণ করা হয়েছে। তবে এটির মূল উদ্দেশ্য ছিল শিশুদের গল্পের মাধ্যমে রাজনীতি, কূটনীতি, নৈতিকতা এবং জীবনবোধের শিক্ষাদান করা। যাইহোক 'পঞ্চতন্ত্র' শব্দটির অর্থ হল পাঁচ নীতি বা প্রবন্ধের সংকলন আর এই অর্থ অনুযায়ী পঞ্চতন্ত্রের পাঁচটি ভাগ হল মিত্রভেদ- যার অর্থ শত্রুর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি, মিত্রলাভ অর্থাৎ বন্ধু অর্জন, কাকোলূকীয়ম অর্থাৎ কৌশল ও কূটনীতি, লাভপক্ষরণম বা অর্জিত জয় রক্ষা এবং অপরীক্ষিতকারকম বা বিবেচনাহীন সিদ্ধান্তের বিপর্যয়।

এই গল্পগুলোতে বিভিন্ন প্রাণীকে প্রধান চরিত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, যেমন সিংহ, বানর, কুমির, কাক, পেঁচা ইত্যাদি। প্রাণীগুলোকে মানবজাতির বিভিন্ন গুণাবলী ও স্বভাবের অধিকারী এরূপ প্রতীক হিসেবে দেখানো হয়েছে এবং গল্পগুলোতে হাস্যরস ও কল্পনার সঙ্গে নৈতিক শিক্ষার এক গভীর সংমিশ্রণ রয়েছে, যা পাঠককে আনন্দ আস্বাদনের সুযোগের পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষাও দেয়। অর্থাৎ পঞ্চতন্ত্র মূলত কৌশল, প্রজ্ঞা ও নৈতিকতার এক সমন্বয় একথা সহজেয় অনুমেয় করা যায়। এক্ষেত্রে কৌটিল্যর অর্থশাস্ত্র বা মহাভারতের নীতি-দর্শনের সঙ্গে পঞ্চতন্ত্রের মিল লক্ষ্য করা যায়। প্রসঙ্গত, এই গ্রন্থের প্রভাব কেবল ভারতেই সীমিত ছিল না; মধ্যযুগে এটি পারস্য, আরব, তুরস্ক এবং ইউরোপে অনূদিত হয়ে বিশ্বসাহিত্যের অংশ হয়ে ওঠে। তাই পঞ্চতন্ত্র শুধু একটি শিশুসাহিত্য নয়, বরং নৈতিক ও রাজনৈতিক শিক্ষা, কৌশলগত বুদ্ধিমত্তা এবং সামাজিক জীবনচর্চার একটি যুগান্তকারী দলিলস্বরূপ। তাই পঞ্চতন্ত্র সম্পর্কে হিতোপদেশে বলা হয়েছে-

"নহেন সামান্য নর এই গ্রন্থ যার

নরলোকে বিষ্ণুশর্মা দেব অবতার
পশু- পক্ষী উপকথা উপলক্ষ্য তাঁর
এ হিতোপদেশ সর্ব জ্ঞানের ভাণ্ডার
দিব্য কল্পতরু দেয় বাঞ্ছিত কেবল
এ হিতোপদেশ দেয় বাঞ্ছাধিক ফল
অলঘ্য ইহার নীতি নাহিক সংশয়
প্রতিক্ষণে প্রতিকার্যে পাবে পরিচয়
বৃদ্ধের গৃহিণী ইহা, শিশুর জননী
যুবার সংকট সিন্ধুপারের তরণী।" (মুখোপাধ্যায়, ১৮৭১, পৃ. ১)

অর্থাৎ "পঞ্চতন্ত্র কেবল গল্প নয়, এটি জীবনযাপনের মূলনীতি তথা জীবন দর্শন ।

পঞ্চতন্ত্রের পঞ্চভাগ পরিচিতি:

১. মিত্রভেদ (Separation of Friends / Shattering Alliances)

একবার একটি জঙ্গলে দুটি শিয়াল একসাথে শিকার করতে যায়। তারা প্রথমে মিলেমিশে শিকার করে, কিন্তু শিয়ালদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও স্বার্থপরতা দেখা দেয়। এক সময় শিয়ালরা একে অপরের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে থাকে। এক শিয়াল অন্যটিকে প্ররোচিত করে, যার ফলে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। অবশেষে একজন শিয়াল বিপদে পড়ে এবং তার জীবনহানি হয়। অর্থাৎ মিত্রভেদ নীতি শেখায় যে শত্রুর মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করা কৌশলগতভাবে নিজশক্তি বৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করে। শত্রুর দুর্বলতা চিহ্নিত করে বিভাজন সৃষ্টি করলে, সরাসরি সংঘাতের পরিবর্তে লক্ষ্য অর্জন সম্ভব। এটি কেবল নৈতিক শিক্ষা নয়, বরং রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কৌশল হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ। যেমন আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে শত্রু রাষ্ট্রের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করে কৌশলগত ও অর্থনৈতিক সুবিধা অর্জন করা সম্ভব হয়।

২. মিত্রলাভ (Gaining Friends / Building Alliances)

একবার একটি বানর নদীর ধারে বসে বিশ্রাম নিচ্ছিল, হঠাৎ নদীতে একটি কুমির উপস্থিত হয়। প্রথমে বানর ভয় পায়, কিন্তু কুমিরটি বন্ধুত্বের প্রস্তাব দেয়। বানর সতর্ক থাকে, তবে কৌশল অবলম্বন করে কুমিরের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে। পরবর্তীতে, কুমির বানরের ক্ষতি করার চেষ্টা করলে বানর তার বুদ্ধি ও সতর্কতা ব্যবহার করে বিপদ এড়ায়। বানর বুঝতে পারে, সরাসরি শক্তি প্রদর্শন না করে কৌশল, বন্ধুত্ব এবং সম্পর্ক বজায় রাখাই সবচেয়ে কার্যকর।বানর এবং কুমিরের সম্পর্ক কেবল বন্ধুত্ব নয়, এটি কৌশলগত মিত্রতা ও নিরাপত্তার একটি উদাহরণ। বানরের বুদ্ধি এবং সতর্কতা তাকে বিপদ থেকে রক্ষা করেছে এবং ভবিষ্যতে আরও শক্তিশালী ও নিরাপদ অবস্থান নিশ্চিত করেছে। অর্থাৎ মিত্রলাভ শেখায় কৌশলগত মিত্রতা, সম্পর্ক রক্ষা এবং সতর্কতার মাধ্যমে সুবিধা অর্জনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এই নীতির রাজনৈতিক প্রাসঙ্গিকতা হল রাষ্ট্রসমূহ কৌশলগত মিত্রতা স্থাপন করে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সুবিধা অর্জন করে।উদাহরণস্বরূপ, ভারতের কৌশলগত সম্পর্ক যেমন- ভারত-বাংলাদেশ, ভারত-জাপান বা ভারত-মধ্যপ্রাচ্য দেশগুলোর সঙ্গে কৌশলগত মৈত্রী স্থাপন।

৩. কাকোলূকীয়ম (Strategic Maneuvering)

কাকোলূকীয়মতন্ত্রের কাক ও পেঁচা গল্পে দেখানো হয়েছে, সরাসরি শক্তি ব্যবহার না করে বুদ্ধি, কৌশল এবং সহযোগিতার মাধ্যমেও শত্রুকে পরাস্ত করা যায়।এই গল্পে কাকরা দলবদ্ধভাবে পেঁচাদের বিভ্রান্ত করে এবং

বিজয় লাভ করে। গল্পটি হল- একবার একটি ঘন জঙ্গলে কাকের দল বাস করত। তারা শান্তিতে ও মিলেমিশে জীবন যাপন করত। কিন্তু হঠাৎ একটি পেঁচা দল তাদের উপর আক্রমণ করতে আসে। পেঁচারা শক্তিশালী এবং সরাসরি আক্রমণ করলে কাকদের অনেক ক্ষতি হতে পারে এটি কাকরা বুঝতে পারে। তাই তারা সরাসরি শক্তি ব্যবহার করে পেঁচাদের মোকাবিলা না করে একটি কৌশল তৈরি করে। প্রথমে তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে এবং সবাইকে বিভাজিতভাবে কাজ করার নির্দেশ দেয়। কয়েকটি কাক পেঁচাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে উচ্চ শব্দে ডাক দেয়, অন্য কাকরা পালাক্রমে উড়ে যায় এবং আক্রমণকারীদের দিক পরিবর্তন করে। আরও কয়েকটি কাক পেঁচাদের দৃষ্টি বিভ্রান্ত করার জন্য লম্বা করে উড়ে যায়, যাতে তারা নিরাপদভাবে তাদের খাদ্য ও বাচ্চাদের রক্ষা করতে পারে।

কাকরা দলবদ্ধভাবে এবং নির্ধারিত কৌশল অনুসরণ করে কাজ চালায়। তারা সরাসরি লড়াই না করেও পেঁচাদের বিভ্রান্ত করে তাদের আক্রমণ ব্যর্থ করতে সক্ষম হয়। অবশেষে, কাকরা নিজের খাদ্য ও বাচ্চাদের নিরাপদ রাখতে সক্ষম হয়। গল্পের শেষে, কাকরা বুঝতে পারে যে শক্তি নয়, বুদ্ধি, দলবদ্ধতা এবং প্রকৃত কৌশলই তাদের রক্ষা করেছে। তাই এক্ষেত্রে আমরা শাসন নীতির মূল কৌশল হিসেবে পায়- সহযোগিতা ও দলবদ্ধতা, ভ্রম 9বা বিভ্রান্তি (Diversion), ভূমিকা-বণ্টন (Role allocation), তথ্যসংগ্রহ ও নজরদারি (Intelligence & Reconnaissance), সময়ে আঘাত বা সুযোগের সদ্ব্যবহার (Timing & Opportunism), সংরক্ষণ ও প্রত্যাহার কৌশল (Fallback / Safeguards)।

৪. লাভপক্ষরণম (Preserving Gains / Securing Achievements)

একবার একটি শান্ত পুকুরে বিভিন্ন প্রাণী বাস করত যেমন মাছ, ব্যাঙ, কুমির এবং কিছু ছোট পাখি। পুকুরটি সমৃদ্ধ ছিল, তাই বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে প্রায়ই সম্পদ ও খাদ্য নিয়ে দ্বন্দ্ব হতো। একটি ব্যাঙ সেই পুকুরে বসবাস করত এবং সে সর্বদা তার নিরাপত্তা ও অর্জিত সম্পদ রক্ষা করার দিকে মনোযোগ দিত।

একদিন পুকুরে একটি মাছ ও একটি সাপের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। মাছটি সাপের প্রতি আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে এবং সাপও প্রতিরোধে নেমে আসে। অনেক প্রাণী সরাসরি সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে এবং তাদের ক্ষতি হয়। কিন্তু ব্যাঙ সরাসরি লড়াইয়ে জড়ায়নি। সে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে, কোনটা ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে, কোনটা তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে তা বিশ্লেষণ করতে থাকে। ব্যাঙ পরিকল্পনা করে যে কোথায় স্থির থাকলে সে তার নিরাপত্তা ও অর্জিত সুবিধা বজায় রাখতে পারে। সে ধীরে ধীরে এবং সতর্কভাবে পুকুরের মধ্যে নিরাপদ জায়গায় চলে যায় এবং পরিস্থিতি বিবেচনা করে নিজের খাদ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। অন্য প্রাণীরা লোভ বা আগ্রাসী পদক্ষেপের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও, ব্যাঙের সতর্কতা এবং কৌশল তাকে রক্ষা করে। এরপর ব্যাঙ শেখে যে শুধু সম্পদ অর্জন করা নয়, তাকে রক্ষা করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। যদি কোনো অর্জিত সুবিধা সংরক্ষণ করা না হয়, তা স্থায়ী হয় না। তাই ব্যাঙ সবসময় সতর্ক থাকে, ঝুঁকি মূল্যায়ন করে পদক্ষেপ নেয় এবং তার সম্পদ ও সুরক্ষা বজায় রাখে। যে ব্যবহারিক কৌশল ব্যাঙ এখানে প্রয়োগ করে তা হল-

পরিস্থিতি মূল্যায়ন (Situation Assessment): নিজের ঝুঁকি ও সুযোগ বোঝার জন্য পরিবেশকে পর্যবেক্ষণ।

নিরাপদ স্থান নির্ধারণ (Identify Safe Zones): দুর্যোগ বুঝে প্রয়োজনে প্রত্যাহার বা নিরাপদ অবস্থান করা।

ধাপে ধাপে পদক্ষেপ (Stepwise Action): সরাসরি ঝুঁকি না নিয়ে পরিকল্পিতভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ।

নিয়মিত নজরদারি (Continuous Monitoring): পরিবেশ পরিবর্তনের সাথে সাথে পদক্ষেপ সমন্বয় করতে হবে ।

সম্পদ সংরক্ষণ (Preserve Gains): অর্জিত সম্পদ, খাদ্য ও নিরাপত্তা রক্ষা করা।

লাভপক্ষরণম শেখায় যে অর্জিত জয়, ক্ষমতা বা সম্পদ রক্ষা করা অপরিহার্য। শুধু অর্জনই যথেষ্ট নয়; তা কৌশল এবং সতর্কতা অবলম্বন করে সংরক্ষণ করতে হবে এবং সুযোগ বুঝে সেটির সদব্যবহার করতে হবে।

৫. অপরীক্ষিতকারক (Rash Action)

পঞ্চতন্ত্রের পঞ্চম তন্ত্র হলো 'অপরীক্ষিতকারক' (অর্থাৎ—যথেষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করে কোনো কাজ করা)। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এই ভাগটির গুরুত্ব অপরিসীম, কারণ এটি একজন শাসককে হঠকারিতা ও আবেগপ্রসূত সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে। এই তন্ত্রের সবচেয়ে বিখ্যাত এবং রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ গল্পটি হলো 'ব্রাহ্মণ ও নেউলের গল্প' তথা এক ব্রাহ্মণ দম্পতি তাদের শিশু সন্তানকে একটি পোষা নেউলের পাহারায় রেখে বাইরে যান। কিছুক্ষণ পর একটি বিষধর সাপ শিশুর দিকে এগোতে থাকলে নেউলটি লড়াই করে সাপটিকে মেরে ফেলে। ব্রাহ্মণ ফিরে এসে দেখেন নেউলের মুখ রক্তে মাখা। কোনো কিছু বিচার না করেই তিনি ধরে নেন যে নেউলটি তাঁর সন্তানকে মেরে ফেলেছে এবং রাগের মাথায় তিনি একটি ভারী লাঠি দিয়ে নেউলটিকে মেরে ফেলেন। ভেতরে গিয়ে তিনি দেখেন সন্তান সুস্থ আছে এবং পাশে একটি সাপ মরে পড়ে আছে। নিজের হঠকারী সিদ্ধান্তের জন্য ব্রাহ্মণ আজীবন অনুতপ্ত হন।

এই গল্পের তাৎপর্য হল রাজনীতিতে কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার আগে প্রাপ্ত তথ্যের সত্যতা যাচাই করা বাধ্যতামূলক। যথাযথ প্রমাণ বা সাক্ষ্য ছাড়া কাউকে শাস্তি দেওয়া রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতার জন্য ক্ষতিকর এবং ক্রোধ বা আবেগ একজন শাসকের প্রধান শত্রু। রাগের মাথায় নেওয়া সিদ্ধান্ত কেবল একজন বিশ্বস্ত সহযোগীকে (নেউল তথা মিত্র) হারায় না, বরং শাসকের ভাবমূর্তিও নষ্ট করে।

রাজনৈতিক বাস্তববাদ প্রসঙ্গে পঞ্চতন্ত্র:

প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাভাবনা দেখিয়েছে যে শক্তি, স্বার্থ এবং বাস্তবিক পরিস্থিতি বিবেচনা করাই নেতৃত্ব ও রাষ্ট্র পরিচালনার মূল ভিত্তি। শাসকের শক্তি, কৌশল এবং প্রজ্ঞার সমন্বয়ই স্থায়ী নেতৃত্ব ও রাষ্ট্র পরিচালনার মূল চাবিকাঠি। আবার নৈতিকতা কখনো সহায়ক, কখনো সীমাবদ্ধ। পঞ্চতন্ত্র প্রমাণ করে যে, রাজনীতি ও কূটনীতি কেবল শক্তি প্রদর্শনের উপর নির্ভর করে না; বরং বুদ্ধি, কৌশল এবং বাস্তবিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই পঞ্চতন্ত্রের পাঁচ নীতি আধুনিক রাজনৈতিক বাস্তববাদের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। শত্রু বিভাজন, কৌশলগত মিত্রতা, কূটনীতি ও চক্রান্ত, অর্জিত ক্ষমতা রক্ষা এবং সতর্কতামূলক সিদ্ধান্তগ্রহণ এগুলো সবই Realpolitik-এর মূল ধারণা। আধুনিক রাষ্ট্র, প্রশাসন ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই শিক্ষা যুগ যুগ ধরে প্রাসঙ্গিক ছিল এবং বর্তমানেও তা প্রাসঙ্গিক। আর পঞ্চতন্ত্রের মূল পাঁচটি নীতি তথা মিত্রভেদ, মিত্রলাভ, কাকোলূকীয়ম, লাভপক্ষরণম এবং অপরীক্ষিতকারকম রাজনৈতিক বাস্তববাদের (Political Realism) ভিত্তিতে বিশ্লেষণযোগ্য-

১. মিত্রভেদ (Shattering Alliances) হল বিভাজন ও শাসন (Divide and Rule) নীতির প্রাচীন রূপ। শত্রু বা প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে তাদের একত্রিত শক্তি ভেঙে দেয়া যায়। আধুনিক তাত্ত্বিক যেমন ম্যাকিয়াভেলি এবং হ্যান্স মরগেনথাউও দেখিয়েছেন, শত্রুর মধ্যে বিভাজননীতি রাষ্ট্র ও নেতৃত্বের শক্তি

বৃদ্ধিতে কার্যকর। প্রসঙ্গত ব্রিটিশ ভারতে এই নীতির প্রয়োগ করেই হিন্দু মুসলিম বিভাজন সৃষ্টি করা হয়েছিল।

২. মিত্রলাভ (Building Alliances) নীতি দেখায় যে কৌশলগত সেটেলমেন্ট বা অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি হল রাষ্ট্রশক্তি বৃদ্ধির প্রধান উপায়। এটি Coalition Theory বা Alliances- এর মূল ভিত্তি। রাষ্ট্র যৌথভাবে অন্য রাষ্ট্রের সাথে যুক্ত হয়ে কিভাবে নিজশক্তি বাড়ায় এবং প্রশাসনিকক্ষেত্রে ও বৈদেশিক কূটনীতিতে এটি কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে সে সম্পর্কিত আলোচনা আমরা এই অংশে পায়। যেমন- ভারত ও জাপানের কৌশলগত অংশীদারিত্ব এক্ষেত্রে একটি উদাহরণ যেটি দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক ও কৌশলগত সম্পর্ককে কেন্দ্র করে গড়ে এবং যা উভয়ের জন্যই লাভজনক।

৩. কাকোলূকীয়ম (Strategic Maneuvering) হল রাজনীতিতে সরাসরি সংঘাত এড়িয়ে কৌশল ও বুদ্ধি ব্যবহার করা। এটি Indirect Strategy Theory বা Sun Tzu-এর "Art of War"-এর ধারণার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। যা যুদ্ধের ঝুঁকি কমানো, সম্পদ বাঁচানো এবং জাতীয় লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে কার্যকর।

৪. লাভপক্ষরণম (Preserving Gains) যা Consolidation of Power বা অর্জিত সম্পদের রক্ষণনীতির প্রতিফলন। শাসকের বিজয় বা ক্ষমতা অর্জন কেবল রাষ্ট্রের জন্য যথেষ্ট নয়; তা রক্ষা করা, পুনর্গঠন করা ও ধীরে ধীরে আরও শক্তিশালী করাও অপরিহার্য। রাজনীতি ও কূটনীতিতে নিজ শক্তি স্থায়ী করতে, অর্জিত সুবিধার সংরক্ষণ করতে এবং তার সঠিকভাবে বিনিয়োগ করাই হল আসল।

৫. অপরীক্ষিতকারকম (Avoiding Rash Actions / Prudence) অর্থাৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সতর্কতা, ঝুঁকি মূল্যায়ন ও পূর্বপরিকল্পনা গ্রহণ হল যৌক্তিক সিধান্তগ্রহণ তত্বের অন্তর্ভুক্ত। রাজনৈতিক বা সামরিক পদক্ষেপের আগে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ না করলে ক্ষতি হবার সম্ভবনা বেশি থাকে তাই প্রশাসনে "Risk Assessment" ও কৌশলগত পরিকল্পনার গুরুত্ব এই নীতিতে প্রতিফলিত হয়েছে।

পঞ্চতন্ত্র ও কূটনীতি শিক্ষা:

ভারতীয় নীতিশাস্ত্রের ইতিহাসে পঞ্চতন্ত্র সাধারণত শিশুদের গল্পের বই হিসেবে পরিচিত হলেও বাস্তবে এটি রাজনৈতিক মনস্তত্ত্ব, রাষ্ট্রনীতি, নেতৃত্ব, প্রশাসন ও কূটনীতি— এই সবকিছুর গভীর শিক্ষায় পূর্ণ এক অমূল্য গ্রন্থ। কথিত রয়েছে যে, বিষ্ণুশর্মা এই উপকথাগুলির মাধ্যমে রাজপুত্রদের শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন, যাতে তারা রাজ্যশাসনের বাস্তব অভিজ্ঞতা, রাজনৈতিক সতর্কতা, নেতৃত্বের মেধা, শত্রুমিত্র বাছাই এবং কূটচাল বোঝার উপযোগী হয়। পঞ্চতন্ত্রের গল্পগুলোতে মূলত প্রাণী চরিত্র ব্যবহৃত হয়েছে— সিংহ, শিয়াল, কাক, সাপ, বানর, কচ্ছপ, হরিণ ইত্যাদি যাদের আচরণ, বুদ্ধি, লোভ, ভয়, উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা দুর্বলতা মানব সমাজের প্রকৃতির প্রতীক। ফলে পঞ্চতন্ত্র রাষ্ট্রশাস্ত্রকে সহজলভ্য করেছে যাতে শিশুমন তার সারমর্ম উপলব্ধি করতে পারে। গ্রন্থটির কূটনৈতিক দিক সবচেয়ে সুস্পষ্ট হয় চারটি প্রধান উপায়ের বিশ্লেষণে যথা সাম (আলোচনা), দাম (উপহার বা প্রলোভন), দণ্ড (শাস্তি বা বলপ্রয়োগ) ও ভেদ (বিভেদ সৃষ্টি)। এই চার নীতি কেবল পঞ্চতন্ত্রে নয়, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও একই ক্রমে উঠে এসেছে। অর্থশাস্ত্রে এগুলোকেই বাস্তব রাষ্ট্রশাসন কাঠামোয় সাজানো হয়েছে, আর পঞ্চতন্ত্রে চরিত্র ও পরিস্থিতির মাধ্যমে সেগুলির জীবন্ত উদাহরণ দেওয়া হয়েছে।

তবে একথা সত্য যে, প্রাচীন ভারতীয় রাজনৈতিক ভাবনা চিরকালই বাস্তববাদী ও যুক্তিসঙ্গত ছিল। মহাভারত, মনুস্মৃতি, নীতিশাস্ত্র, কামন্দক নীতিসার, বৌদ্ধ-জৈন কূটনীতিতেও এই চার উপায়ের উল্লেখ আছে। রাষ্ট্রের শক্তি রক্ষা, শত্রু নিয়ন্ত্রণ, বন্ধুত্ব গঠন এবং ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় রাখতে এই চার উপায়ের

গুরুত্ব অপরিসীম। ঠিক যেমন কৌটিল্য এই পদ্ধতিগুলোকে স্পষ্ট ও বৈজ্ঞানিক করে তুলেছিলেন তাঁর অর্থশাস্ত্রে তথা প্রথমে শান্তি বা সাম, তারপর সুবিধা দিয়ে জয় বা দাম, তারপর শাস্তি বা বলপ্রয়োগ বা দণ্ড, সর্বশেষে শত্রুকে ভিতর থেকে ভেঙে দেওয়া বা ভেদ তেমনই বহুপূর্বে পঞ্চতন্ত্র এই একই নীতিকে গল্পের ছলে আরও মানবিক, মনস্তাত্ত্বিক ও শিক্ষাপ্রদ রূপ প্রদান করেছে। পঞ্চতন্ত্রের আলোকে এই চারটি নীতিকে নিম্নে বিশ্লেষণ করা হল-

১. সাম (Concilliation): আলোচনা, সমঝোতা ও শান্তিকূটনীতির এক সমন্বিত রূপ বা সাম হল সংঘাত এড়াতে শান্তি, আলোচনা, পরামর্শ ও বুদ্ধিমত্তার পথ। পঞ্চতন্ত্রে এটিকে প্রথম এবং সবচেয়ে মানবিক কৌশল হিসেবে দেখা হয়েছে তথা বিবাদের আগে কথা বলাই শ্রেয়; কথায় যা হয়, শক্তি প্রয়োগেও তা সবসময় সম্ভব হয় না– তা গল্পের দ্বারা বোঝানো হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে 'মিত্রভেদ' অধ্যায়ের সিংহ ও ষাঁড়ের কাহিনী উল্লেখ্য, যেখানে সিংহ (মহাশ্বেত) এবং ষাঁড় (সঞ্জীবক) প্রথমে খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। এই বন্ধুত্ব রাজ্যকে শান্ত ও শক্তিশালী করে তুলেছিল। শত্রুপক্ষ বুঝত সিংহের শক্তি এবং ষাঁড়ের বুদ্ধি মিলে তারা অজেয়। এখানে শেখানো হয়, দ্বন্দ্ব নিরসনের প্রথম উপায় সবসময় আলোচনা এবং সম্পর্ক ভেঙে যাওয়া রোধ করতে কথার ভূমিকা ও বিশ্বস্ত উপদেষ্টার গুরুত্ব। অর্থাৎ শাসককে প্রথমে কূটনৈতিক সমঝোতায় বিশ্বাস করতে হবে। যেসব ভুল বোঝাবুঝি সংঘাত ডেকে আনে তা তাদের পারস্পরিক আলোচনা দিয়ে সমাধান করতে হবে।

অর্থশাস্ত্রেও কৌটিল্য সামকে রাষ্ট্রের প্রথম কূটনৈতিক উপায় হিসেবে দেখিয়েছেন। তাঁর মতে, দূত পাঠিয়ে চুক্তি করা, শর্ত নির্ধারণ, সুবিধাজনক শান্তিচুক্তি, মিত্রতা ও জোট, প্রতিশ্রুতি বিনিময়, একে অপরের প্রতি আস্থা রক্ষা এসবই সামের অন্তর্ভুক্ত। কৌটিল্য এর মতে, যেখানে যুদ্ধের খরচ লাভের চেয়ে বেশি, সেখানে সামই সর্বোত্তম পথ। (Kautilya, 1992)

২. দাম (Gift): দাম হলো প্রলোভন, উপহার, সুবিধা বা পুরস্কার দিয়ে কাউকে নিজের পক্ষে আনা। পঞ্চতন্ত্রে বহু চরিত্রকে দেখা যায় কারও লোভ, কারও প্রয়োজন, কারও দুর্বলতাকে ব্যবহার করা হয়। 'মিত্রসম্প্রাপ্তি' অধ্যায়ের উদাহরণ বানর ও কুমিরের কাহিনীতে দেখা যায় কুমির তার স্ত্রীর অনুরোধে বানরকে প্রতারণা করতে চায়। গল্পে কুমির বারবার বানরকে উপহার, নিরাপদ জলের কথা, আরাম এসব দেখিয়ে আকৃষ্ট করতে থাকে। এখানে প্রলোভন ব্যবহারের কৌশল স্পষ্ট। অর্থাৎ মানুষ বা শত্রুর লোভ চিনে তা কূটনৈতিক সম্পদে রূপান্তর করাই হল শাসন নীতির অন্যতম কৌশল। বাস্তবপক্ষে দর কষাকষি ও বিভিন্ন প্রস্তাবের দ্বারা ব্যক্তির দুর্বলতা বুঝে কৌশল প্রয়োগই হল এটির মনস্তাত্ত্বিক মূল্য।

অর্থশাস্ত্রে কৌটিল্য দামকে বর্ণনা করেছেন, অর্থনৈতিক বা কৌশলগত প্রলোভন ব্যবহার করে জয়লাভের এক উপায় হিসেবে। দামের প্রকৃতি হল উপহার, ভূমির প্রতিশ্রুতি, রাজস্ব কমানো, বাণিজ্য, কোনও পক্ষকে নিরপেক্ষ করার জন্য অর্থ সাহায্য ইত্যাদি। কৌটিল্য বলেন "যে শত্রুকে আলোচনায় আনা যায় না, তাকে দামে আনা যায়"(Kautilya, 1992)। এটি আধুনিক কূটনীতিতে অর্থনৈতিক সাহায্য, ঋণগ্রহণ, বাণিজ্যিক চুক্তি, সামরিক সহযোগিতা ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক।

৩. দণ্ড (Force): পঞ্চতন্ত্রে বোঝানো হয়েছে যখন আলোচনা ও প্রলোভন ব্যর্থ হয়, তখন রাষ্ট্রকে শক্তি, শাস্তি, প্রতিরোধ ও সামরিক কূটনীতি প্রয়োগ করতে হয়। উদাহরণ হিসেবে কাক ও সাপের গল্পে সাপ বারবার কাকের বাচ্চা খেয়ে নেয়। আলোচনা বা প্রলোভন এখানে কাজ করে না তাই শেষে কাক ও শেয়াল একটি কৌশল করে সাপকে হত্যা করে। এখানে দেখানো হয় শত্রুকে চিহ্নিত করা তথা শক্তির প্রয়োগ করে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

অর্থশাস্ত্রে দণ্ডকে রাষ্ট্রের মেরুদণ্ড হিসেবে উল্লেখ করে কৌটিল্য বলেন "দণ্ডই রাষ্ট্রের নিয়ম, শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচারের ভিত্তি।" দণ্ডের ক্ষেত্র বা উপাদান হল সেনাবাহিনী, নিরাপত্তা ব্যবস্থা, সন্ত্রাস দমন, শাস্তি ও ন্যায়বিচার, সীমান্ত রক্ষা এবং যুদ্ধনীতি। কৌটিল্য যুক্তি দেন শান্তির জন্য শক্তি আবশ্যক এবং দুর্বল রাষ্ট্রকে যেহেতু কেউ সম্মান করে না তাই শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ উপকরণ থাকা জরুরি। এক্ষেত্রে ক্ষমতা একটি রাজনৈতিক পুঁজি এবং এটি আধুনিক আন্তর্জাতিক সম্পর্কে Realism, Deterrence ও Hard Power-এর সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৪. ভেদ (Rupture): ভেদ হল বিভেদ সৃষ্টি, গোপনচর বা মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ। ভেদ অন্য চার উপায়ের মধ্যে সবচেয়ে সূক্ষ্ম, বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন ও মনস্তাত্ত্বিক কৌশল।পঞ্চতন্ত্রে ভেদ (মিত্রভেদ) অংশের এক গল্পে দেখানো হয় যে একটি শিয়াল প্রথমে শান্তিকামী ছিল, কিন্তু নিজের স্বার্থে পরে ষাঁড়কে সিংহের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে। এই গল্পের শিক্ষা হল শত্রুকে ভিতর থেকে দুর্বল করা, গুজব ছড়ানো, মনের আস্থা ভাঙা, সন্দেহ সৃষ্টি, রাজনৈতিক বিভাজন হল ভেদনীতির মূল কৌশল। ভেদ শেখায় রাজনীতি শুধু শক্তি দ্বারা টিকে থাকে না বরং বুদ্ধি, কৌশল ও মনস্তত্ত্বই রাজনীতির সবচেয়ে বড় অস্ত্র। অর্থশাস্ত্রে ভেদ এর উপায় হিসেবে গুপ্তচর নেটওয়ার্ক, শত্রুপক্ষের মন্ত্রীকে ভাঙানো,ভুল তথ্য প্রচার, অবিশ্বাস তৈরি, বিদ্রোহ উসকে দেওয়া, রাজনৈতিক জোট ভাঙানো, মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব ইত্যাদি উল্লেখ করা হয়েছে। কৌটিল্য বলেন "যুদ্ধ ছাড়াই শত্রুকে ধ্বংস করার শ্রেষ্ঠ পন্থা হলো ভেদ" (Kautilya, 1992)। আন্তর্জাতিক সম্পর্কে যার আধুনিক পরিভাষা হল Espionage, Propaganda, Covert Action, Psychological Warfare, Deep State Tactics।

পঞ্চতন্ত্রে ষড়গুন তত্ত্ব:

প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরার ক্ষেত্রে পঞ্চতন্ত্র এবং কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র (Arthashastra) দুটিই বিশেষ গ্রন্থ। কারণ উভয়ই রাষ্ট্র পরিচালনার ষড়গুণ নীতি বা ছয়টি কৌশল নিয়ে আলোচনা করে। তবে, উপস্থাপনাগত ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে। পঞ্চতন্ত্রের সমস্ত নীতি শেখানো হয় গল্পের মাধ্যমে, যেখানে নৈতিকতা, বুদ্ধি ও সামাজিক কৌশলকে জোর দেওয়া হয় আর অন্যদিকে কৌটিল্য রাষ্ট্রকে একটি সামরিক-অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে দেখেন, যেখানে যুদ্ধ, গুপ্তচর, অর্থনীতি ইত্যাদি কৌশলকে রাষ্ট্র পরিচালনার মূল শক্তি হিসেবে দর্শানো হয়েছে।

বিষ্ণুশর্মা রচিত পঞ্চতন্ত্র কেবল গল্প সংকলন নয়, এটি ছিল মূলত রাজপুত্রদের সুশাসক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য একটি শাস্ত্র বা 'রাজনীতি শাস্ত্র'। একইসাথে এটি প্রাচীন ভারতীয় রাজনৈতিক দর্শনের (Political Philosophy) একটি প্রায়োগিক কাঠামো যেখানে বিষ্ণুশর্মা দেখিয়েছেন যে, রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে নৈতিকতার চেয়ে 'ফলপ্রসূতা' বা ফলাফল বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তবে সুকৌশলে রাজ্য পরিচালনা এবং শত্রুকে পরাজিত করার জন্য এপ্রসঙ্গে পঞ্চতন্ত্রে ষড়গুণ বা ছয়টি কৌশলের কথা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আলোচনা করা হয়েছে।প্রাচীন ভারতীয় কূটনীতিবিদ কৌটিল্যের মতো বিষ্ণুশর্মাও রাজধর্মের এই ছয়টি গুণের কথা উল্লেখ করেছেন এবং এই ষড়গুণ হল রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি বা বৈদেশিক নীতি পরিচালনার ছয়টি মূল স্তম্ভ। নিচে এই ৬ টি গুণ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো:

১. সন্ধি (Treaty/Peace)

যখন দুই পক্ষের বা দুই রাষ্ট্রের শক্তি সমান থাকে অথবা শত্রু যখন অপ্রতিরোধ্য হয়, তখন নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য চুক্তিতে আসাই হলো সন্ধি।উদাহরণ হিসেবে পঞ্চতন্ত্রের 'কাকোলূকীয়ম' (কাক ও পেঁচার যুদ্ধ) পর্বে দেখা যায়, যখন একপক্ষ বুঝতে পারে যে সরাসরি যুদ্ধে জয় অসম্ভব, তখন তারা সাময়িকভাবে শত্রুর সাথে মৈত্রী বা সন্ধির অভিনয় করে সময়ক্ষেপণ করে।

২. বিগ্রহ (War/Hostility)

শত্রু যখন ব্যথাতুর, দুর্বল বা অভ্যন্তরীণ কোন্দলে জর্জরিত থাকে, তখন তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করাই হল বিগ্রহ। উদাহরণ হিসেবে যখন কাকেরা বুঝতে পারে যে পেঁচারা দিনের বেলা অন্ধ এবং দুর্বল, তখন তারা সেই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে পেঁচাদের গুহায় আগুন লাগিয়ে দেয়। এটি হল একটি সফল বিগ্রহের উদাহরণ।

৩. যান (Expedition/Marching)

যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় রসদ ও সৈন্য নিয়ে শত্রুর সীমানার দিকে অগ্রসর হওয়াকে 'যান' বলা হয়। অর্থাৎ, কোনো রাজা যখন গুপ্তচরের মাধ্যমে জানতে পারেন যে প্রতিবেশী রাজ্যের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে, তখন তিনি কালক্ষেপণ না করে স্বসৈন্যে আক্রমণ করেন। পঞ্চতন্ত্রে সুবর্ণসিদ্ধির গল্পে এই ধরনের কৌশলগত অভিযানের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

৪. আসন (Neutrality/Wait-and-watch)

প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বা যখন কোনো পক্ষই জয়ের নিশ্চয়তা পায় না, তখন নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করে সঠিক সময়ের জন্য অপেক্ষা করাই হলো আসন। পঞ্চতন্ত্রের গল্পে আমরা দেখি ,অনেক সময় বনের পশুরা বলশালী সিংহ বা বাঘের সরাসরি বিরোধিতা না করে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করে তাদের দুর্বল হওয়ার জন্য অপেক্ষা করে। এটি রাজনৈতিক ধৈর্য বা 'Strategic Patience'-এর উদাহরণ।

৫. দ্বৈধীভাব (Duplicity/Double Policy)

এক হাতে শান্তি বজায় রাখা এবং অন্য হাতে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়াই হল একটি আদর্শ রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ মিত্র ও শত্রু উভয়ের সাথেই কৌশলগত সম্পর্ক বজায় রাখা। যেটিকে অনেক সময় smart power এর সাথে তুলনা করা হয়ে থাকে। পঞ্চতন্ত্রের গল্পে দেখা যায় কাকের মন্ত্রী 'স্থিরজীবী' পেঁচাদের দলে যোগ দিয়ে তাদের বিশ্বাস অর্জন করেন (সন্ধি), কিন্তু মনে মনে তাদের ধ্বংসের পরিকল্পনা করেন (বিগ্রহ)। এই দ্বিমুখী নীতিই হলো দ্বৈধীভাব নীতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

৬. সমাশ্রয় (Seeking Protection)

যখন নিজের শক্তি অত্যন্ত নগণ্য এবং শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার কোনো উপায় থাকে না, তখন কোনো অধিকতর শক্তিশালী রাজার আশ্রয় গ্রহণ করাই হল সমাস্রয়। উদাহরন হিসেবে আমরা পঞ্চতন্ত্রের গল্পে দেখি যে, বিপদে পড়ে কপোতরাজ (কবুতরের রাজা) ও তার দল যখন জালে আটকা পড়ে, তখন তারা চিত্রগ্রীব নামক নেতার পরামর্শে একত্রিত হয়ে উড়ে গিয়ে মূষিকরাজের (ইঁদুর) আশ্রয় নেয়। এখানে মূষিকরাজের সাহায্য গ্রহণই হলো সমাশ্রয়।

এই ছয়টি গুণের সমন্বয়কে 'ষড়গুণ্য নীতি' বলা হয়। পঞ্চতন্ত্রের কাহিনিগুলি প্রমাণ করে যে ষড়গুণ নীতি কেবল তাত্ত্বিক ধারণা নয়, বরং বাস্তব রাজনৈতিক কৌশলের গল্পভিত্তিক উপস্থাপনা, আর এই কারণেই পঞ্চতন্ত্র প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার এক অনন্য দলিল।

বিষ্ণুশর্মা রচিত 'পঞ্চতন্ত্র' কেবল সাহিত্যের আঙিনায় সীমাবদ্ধ নয়; এটি সহস্রাব্দ প্রাচীন এক 'পলিটিক্যাল ম্যানিফেস্টো' তথা বিষ্ণুশর্মা রচিত 'পঞ্চতন্ত্র' কেবল নীতিকথার সংকলনও নয়, বরং এটি বিশ্ব-রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে এক অনন্য ও কালোত্তীর্ণ রাজনৈতিক মহাকাব্য। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও কূটনীতির পরিভাষায় আমরা আজ যাকে 'সফট পাওয়ার' (Soft Power) বা 'স্মার্ট পাওয়ার' (Smart Power) হিসেবে অভিহিত করি, তার প্রাজ্ঞ ও সার্থক প্রয়োগ বিষ্ণুশর্মা কয়েক সহস্রাব্দ আগেই রাজপুত্রদের রাষ্ট্রশিক্ষার পাঠ্য

হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। এই গ্রন্থটি একজন শাসককে নিছক সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হিসেবে নয়, বরং একজন দূরদর্শী ও প্রখর ধীসম্পন্ন কৌশলী (Strategist) হিসেবে গড়ে তোলার এক শক্তিশালী হাতিয়ার। বর্তমান বিশ্বরাজনীতির জটিল ও বহুমুখী আবর্তে দাঁড়িয়েও পঞ্চতন্ত্রের 'মিত্রভেদ', 'মিত্রলাভ' কিংবা 'সন্ধি-বিগ্রহের' মতো তত্ত্বগুলো আজও সমভাবে প্রাসঙ্গিক এবং এক নির্ভুল দিকনির্দেশক হিসেবে কাজ করে। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধকৌশল এবং জোটবদ্ধ রাজনীতির যে সূক্ষ্ম মারপ্যাঁচ এই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, তা প্রমাণ করে যে রাষ্ট্র পরিচালনা কেবল একটি প্রশাসনিক দায়িত্ব নয়, বরং এটি এক গভীর বুদ্ধিবৃত্তিক সাধনা। পরিশেষে বলা যায়, পঞ্চতন্ত্র পাঠ কেবল একটি সাহিত্যিক অভিজ্ঞতা নয়, বরং সমকালীন রাষ্ট্রনীতি ও কূটনীতির গূঢ় রহস্য অনুধাবনের জন্য এক অপরিহার্য ও শাশ্বত রাজনৈতিক পাঠ।যদিও রাজনৈতিক দর্শনের ইতিহাসে বিষ্ণুশর্মা, কৌটিল্য এবং নিকোলো মেকিয়াভেলি, এই তিন মনীষীর চিন্তাধারাই 'বাস্তববাদ' বা Realpolitik-এর ওপর প্রতিষ্ঠিত হলেও তাদের প্রয়োগপদ্ধতিতে রয়েছে অনন্য বৈশিষ্ট্য। কৌটিল্য তাঁর 'অর্থশাস্ত্র'-এ একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রকাঠামো, অর্থনীতি ও প্রশাসনিক শৃঙ্খলার মতো 'ম্যাক্রো' বা কাঠামোগত বিষয়গুলোর ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন; আবার মেকিয়াভেলি তাঁর 'দ্য প্রিন্স' গ্রন্থে ক্ষমতার উৎস ও তা টিকিয়ে রাখার জন্য নৈতিকতাহীন রূঢ় বাস্তবতাকে তুলে ধরেছেন। তবে এই দুই মহীরুহের তুলনায় বিষ্ণুশর্মার 'পঞ্চতন্ত্র' অনন্য, কারণ তিনি রূপক গল্পের মাধ্যমে শাসকের মনস্তাত্ত্বিক তীক্ষ্ণতা এবং 'স্মার্ট পাওয়ার'-এর প্রয়োগ শিখিয়েছেন। মেকিয়াভেলি যে রাজাকে 'সিংহ ও শেয়াল'-এর মতো হওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন, বিষ্ণুশর্মা তার সহস্রাব্দ আগেই পশুচরিত্রের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে, প্রবল পরাক্রমশালী সিংহকেও শেয়ালের মতো কৌশলী বুদ্ধি দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। কৌটিল্যের রাজনীতি যেখানে রাষ্ট্রীয় অনুশাসন, পঞ্চতন্ত্র সেখানে ব্যক্তিগত মেধা ও পরিস্থিতির নিরিখে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের এক ব্যবহারিক নির্দেশিকা। পরিশেষে, এই তিন দর্শনের তুলনামূলক বিচার করলে দেখা যায়, বিষ্ণুশর্মা রাজনীতির জটিলতাকে গল্পের ছলে যতটা সহজবোধ্য ও জীবনমুখী করে তুলেছেন, তা বিশ্ব রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে আজও অতুলনীয়।

তথ্যসূত্র:

১। Boesche, R. (2003). Kautilya's Arthashastra on War and Diplomacy. Journal of Military History, 67(1), 9–37.

২। Edgerton, F. (1924). The Panchatantra. Harvard University Press.

৩। Hopkins, E. W. (1924). The Ethics of the Panchatantra. Journal of the American Oriental Society, 44, 1–15.

৪। Jha, G. N. (1924). Kautilya's Political Ideas and the Panchatantra. Journal of the Bihar and Orissa Research Society, 10(3), 211–228.

৫। Kautilya. (1992). Arthashastra (R. Shamasastry, Trans.). Motilal Banarsidass.

৬। Olivelle, P. (1997). Panchatantra: The Book of India's Folk Wisdom. Oxford University Press.

৭। ঘোষ, বিনয়। (১৯৭৯)। ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা। দে'জ পাবলিশিং।

৮। ঘোষ, বিশ্বনাথ। (২০০৫)। ভারতীয় দর্শনে নীতি ও রাজনীতি। আনন্দ পাবলিশার্স।

৯। চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ। (১৯৮২)। প্রাচীন ভারতের বস্তুবাদী চিন্তা। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট।

১০। দে, সুশীলকুমার। (১৯৬২)। ভারতীয় নীতিশাস্ত্রের ইতিহাস। বিশ্বভারতী প্রকাশন।

১১। বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র। (১৯৭১)। ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তা: ধর্ম ও রাজনীতি। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স।
১২। বসু, অমলেন্দু। (১৯৯৪)। প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা ও নীতিশাস্ত্র। দে'জ পাবলিশিং।
১৩। ভট্টাচার্য, শশাঙ্কশেখর। (২০০১)। নীতিশাস্ত্র ও রাজনীতি: প্রাচীন ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিত। বিশ্বভারতী।
১৪। শর্মা, বিষ্ণু। (২০১৯)। পঞ্চতন্ত্র (সুধীরচন্দ্র সরকার, সম্পা.)। আনন্দ পাবলিশার্স।
১৫। মজুমদার, সত্যেন। (১৯৮৫)। ভারতীয় রাজনৈতিক চিন্তা: প্রাচীন যুগ। প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স।
১৬। মুখার্জি, রাধাকমল। (১৯৫৮)। ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি। দে'জ পাবলিশিং।
১৭। মুখোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র। (১৯৬৫)। প্রাচীন ভারতের রাজনীতি ও সমাজনীতি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।
১৮। মুখোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ। (১৮৭১)। হিতোপদেশ। কলকাতা: সংস্কৃত প্রেস।
১৯। রায়, নীহাররঞ্জন। (১৯৭৬)। ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত। দে'জ পাবলিশিং।
২০। লাহিড়ী, সোমনাথ। (২০০৮)। পঞ্চতন্ত্র ও রাজনীতি: এক বিশ্লেষণ। সুবর্ণরেখা পাবলিশার্স।
২১। সরকার, কাল্যান কুমার। (২০১৭)। ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাস। শ্রী ভূমি পাবলিশিং হাউস।
২২। শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। (১৯৫৭)। ভারতীয় নীতি ও নৈতিক দর্শন। এশিয়াটিক সোসাইটি।
২৩। হালদার, হীরালাল। (১৯৮০)। নীতিশাস্ত্র ও কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রের তুলনামূলক অধ্যয়ন। কল্যাণী প্রকাশনী।